বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৫ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৪

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের ভূমিকা: অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ

এম আবু ইউসুফ*
সোনম সাহা
আবদুল খালেক

১। ভূমিকা

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিককে মানসম্পন্ন সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর প্রেক্ষিতে দেশের জনগণকে, বিশেষত গ্রামীণ ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলসমূহের নাগরিকদের সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনতে সরকারের স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোতে তৃণমূল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন এবং ২০১৫-২০৩০ সাল মেয়াদে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিককে সরকারের স্বাস্থ্য কাঠামোর একটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ছাড়াও স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রমের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ, সমন্বয় ও স্বাস্থ্য সেবায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে এবং স্বাস্থ্য খাতে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, যেমন: পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ('হেলথ,* পপুলেশন, নিউট্রিশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম') অর্জনে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ কার্যকরি ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কৌশলপত্রে প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক এর মাধ্যমে চর, উপকূল ও পাহাড়ী এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পাবে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে সুশাসন নিশ্চিত হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিগত দশ বছরের বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতি অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনায় কমিউনিটি ক্লিনিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে পৃথকভাবে জোর দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সর্বশেষ অর্থবছরের (২০১৭-১৮) বাজেট বক্তব্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে আরও ৩৯২টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (বাজেট বক্তৃতা, ২০১৭-১৮, পৃ: ৪১)। এ সকল নথি পর্যালোচনার ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে, কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমটি বাংলাদেশ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সেবার প্রসারের পদক্ষেপের যে পরিধি, তার মূল কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ।

---

* লেখকবৃন্দ যথাক্রমে অধ্যাপক, প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রবন্ধটি সেন্টার অন বাজেট এণ্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি গবেষণার আলোকে রচিত।

তবে লিপিবদ্ধ এসকল প্রত্যাশা, পরিকল্পনা কিংবা দীর্ঘমেয়াদি এই প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে কতটা ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করেছে, গ্রামের সাধারণ, দরিদ্র মানুষের কাছে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দিতে কতটা সফল হয়েছে, মানুষ কতটা উপকার পেয়েছে অথবা তারা আর কী কী সেবা প্রত্যাশা করে, কী কী সংকট আছে বলে তারা মনে করে ইত্যাদি বিষয় বিশদ আলোচনার দাবী রাখে। আর সেই অনুসন্ধিৎসা থেকেই আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা কাঠামো ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের সফলতা অর্জনে সরকারের সদিচ্ছা, সেবাপ্রদানকারীদের ভূমিকা, সেবা গ্রহীতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এই উদ্যোগের কার্যকারিতা, সংকট ও সম্ভাবনাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালের 'আলমা আতা' ঘোষণায় সাক্ষরকারী দেশসমূহের মাঝে একটি যেখানে ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের এক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন সূচকের বিপরীতে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে যার অন্যতম কারণ হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর (যারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ) জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার প্রতুলতা ও অপ্রাপ্যতা। এই সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সারাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক (প্রতি ৬,০০০ মানুষের জন্য ১টি কমিউনিটি ক্লিনিক) স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং ১৯৯৮ সালে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের নির্মাণ শুরু হয়।

বস্তুত বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৮-২০০৩ সাল মেয়াদি 'হেলথ এণ্ড পপুলেশন সেক্টর প্রোগ্রাম' এ স্বাস্থ্য কাঠামোর প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার প্রসার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষত নারী (গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী) ও শিশু (কিশোর কিশোরীসহ) দের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিটি লোকালয়ের জনগোষ্ঠীর দৌড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্য বিবৃত হয়। সেই আলোকে একটি 'এসেনশিয়াল সার্ভিস প্যাকেজ' বা 'প্রয়োজনীয় সেবা গুচ্ছ' নির্ধারণ করা হয় এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দরিদ্র, দুঃস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্য স্থির করা হয়। ১৯৯৮-২০০১ সালের মধ্যে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০টি তে সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। ক্লিনিকে সেবা প্রদানকারীদের 'এসেনশিয়াল সার্ভিস প্যাকেজ' এর প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সক্ষম করে তোলা হয় এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি ক্লিনিকের জন্য ৯-১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিউনিটি গ্রুপ গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তনের পর ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে এই কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করা হয়। এই কার্যক্রমের মেয়াদ নির্ধারিত হয় ৫ বছর (২০০৯-২০১৪) এবং পরবর্তীতে এর মেয়াদ আরও এক বছর বর্ধিত করে ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩,৫০০টি

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় যাতে করে ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র হিসেবে এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর প্রতিটি প্রায় ৬,০০০ মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে। পূর্বে নির্মিত ও ব্যবহার যোগ্য অবস্থায় পুনরুদ্ধারকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের পাশাপাশি আরও ৩,২৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং পুরাতন ১,০৮০টি কমিউনিটি ক্লিনিককে সংস্কার করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশের কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১৩,১৩৬ এ উন্নীত হয়েছে। নতুনভাবে গৃহীত কমিউনিটি ক্লিনিকের এই উদ্যোগ ২০১১ সাল থেকে 'কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার' শিরোনামে পরিচালিত হচ্ছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণকে (বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো। নির্দিষ্টকৃতভাবে এই লক্ষ্যসমূহকে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করা যায়-

১। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে মানসম্পন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া।

২। একটি সমন্বিত উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধীনে সকল কমিউনিটি ক্লিনিককে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোর সাথে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের একটি কার্যকরি রেফারেল লিংকেজ স্থাপন।

৩। নবজাতক, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন।

৪। বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, কিশোর, তরুণ, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

৫। সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য ই-স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মূখ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।

৬। সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানের কার্যকরি সমন্বয়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের আরেকটি মূখ্য উদ্দেশ্য হলো জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কাঠামোর মাঝে একটি কার্যকরি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন করা। মূলত কমিউনিটি ক্লিনিক সরকারে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ স্বরূপ। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ একটি এলাকার স্থানীয় মানুষের প্রদত্ত বারোয়ারী জমিতে (৫ -৭ দশমাংশ জমি) স্থাপন করা হয়, সংস্থাপনার খরচ বহন করে সরকার, ওষুধ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যন্ত্র ও দ্রব্যাদি সরবরাহ করে সরকার, সেবা প্রদানকারীদের নিয়োগ দেয়া হয় সরকারিভাবে, কিন্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যৌথভাবে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত হয়। ২০০৯ সালে গৃহীত নতুন প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৩-১৭ জনে উন্নীত করা হয় এবং কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী রাখা এবং সদস্যদের মাঝে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কমিটির প্রধান হন এবং জমি দাতা ব্যক্তি হন কমিটির আজীবন

সদস্য ও সিনিয়র সচিব। এই ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করার জন্য আরও রয়েছে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ, যাদের মূল দায়িত্ব হলো এলাকার জনগণকে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রদত্ত প্রাথমিক সেবা সম্পর্কে অবহিত করা এবং জনগণকে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।

একটি একক স্বাস্থ্য সেবা ইউনিট হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়: (১) মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা, (২) শিশু স্বাস্থ্য সেবার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, (৩) প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, (৪) নব বিবাহিত দম্পতি, গর্ভবতী মা, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির নিবন্ধন, (৫) পুষ্টি শিক্ষা, পুষ্টি তথ্য ও পুষ্টি সহায়ক ভিটামিন সরবরাহ, (৬) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান, (৭) যক্ষা, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বিপদজনক গর্ভাবস্থা ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ ও উন্নত সেবার জন্য সুপারিশসহ প্রেরণ, (৮) নতুন কোনো ব্যাধি সংক্রমনের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ ও উপজেলা পর্যায়ে সেবার জন্য প্রেরণ, (৯) বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতির অধীন অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, (১০) উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষা, (১১) সাধারণ জ্বর, পেটের পীড়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা প্রদান, এবং (১২) ক্ষেত্র বিশেষে প্রসূতির অবস্থা বিবেচনায় সাধারণ প্রক্রিয়ায় শিশু জন্মদানের ব্যবস্থা করা।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্র বিবেচনায় এটি প্রত্যাশা করা যায় যে, বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উন্নতিতে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ ইতিবাচক ফলাফল রাখতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে কী কী প্রায়োগিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ও সেসব কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে, তা অনুসন্ধানের দাবী রাখে। এই প্রেক্ষিতে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ একটি নির্দিষ্ট লোকালয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কতটা কার্যকরি ভূমিকা রাখছে তথা সরকারের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বাস্তব ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের জন্য আর্থিক সংশ্লেষ ও অবকাঠামোগত সহায়তার পরিধি কতটা প্রাসঙ্গিক, জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা গ্রহণে কতটা আগ্রহী, কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ এর পরিধি কতটা বিস্তৃত এবং সেবা প্রদানকারী ও সেবাগ্রহীতা উভয় পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের সক্ষমতা, সেবার প্রাপ্যতা, কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

২.১। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কার্যকারিতা অনুসন্ধান এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মপদ্ধতি, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কোনো অসঙ্গতি বা অসমন্বয় থাকলে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা।

এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য এই প্রবন্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ওপর আলোকপাত করা হবে-

১। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের জন্য বাজেট বরাদ্দ ও আর্থিক সংশ্লেষের ক্রমধারা বিশ্লেষণ।

২। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের জন্য সরকারিভাবে সরবরাহকৃত ঔষধের প্রকরণ ও মূল্যমানের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ।

৩। সরকারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিকের বাস্তবিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাইয়ের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাগ্রহীতার সংখ্যাগত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতা যাচাই।

৪। মাঠ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কর্মপদ্ধতি, অবকাঠামোগত অবস্থা, সেবা কাঠামোর অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণ।

৫। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের সেবা প্রদানের সক্ষমতা যাচাই ও কার্যক্ষেত্রের সংকটসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৬। সেবা গ্রহীতা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও দৃশ্যমান অসঙ্গতিসমূহ অনুসন্ধান।

৭। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণের কার্যকারিতা যাচাই।

৩। উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে পরিমাণগত (কোয়ান্টিটেটিভ) গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) উভয় গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে সেবার প্রাপ্যতা, সেবার মান, সেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে মাঠ পর্যায়ের জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের পারদর্শিতা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন নথি পর্যালোচনা, মাঠ জরিপ, সরাসরি পর্যবেক্ষণ, দলগত আলোচনা (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) এবং প্রশ্নভিত্তিক জরিপ ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সার্বিক চিত্র নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

দৈবচয়ন পদ্ধতিতে (র‍্যান্ডম স্যামপ্লিং) নির্বাচিত দুইটি উপজেলার (ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া ও মুক্তাগাছা উপজেলা) সকল উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স , ইউনিয়ন হেলথ ও দুই উপজেলার ২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নমুনা হিসেবে বেছে নিয়ে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। আর্থিক সংশ্লেষ, সেবা গ্রহীতার পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ও অবকাঠামোগত সরবরাহের আলোচনায় মাধ্যমিক/গৌণ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ও কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যকারিতা বিচারে প্রাথমিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪। ফলাফল বিশ্লেষণ

৪.১। 'কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার' কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সংশ্লেষের ধারা বিশ্লেষণ

২০০৯ সালে 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের অধীনে 'কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার' প্রকল্পটি নতুন আঙ্গিকে শুরু হওয়ার পর সরকারের বার্ষিক বাজেট পরিকল্পনায় এই খাতে আর্থিক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টিকে প্রাধিকার দেয়া হয়।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই প্রকল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যার মধ্যে ৪৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা প্রকল্প খাতে ব্যয় হয়। অর্থাৎ মোট বরাদ্দের ৯৫ শতাংশ সফলভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে লাগে।

পরবর্তী অর্থবছরে অর্থাৎ ২০১০-২০১১ তে 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের অধীন প্রকল্পসমূহের জন্য বাজেট বরাদ্দ চারগুণ করা হয় (২০৩ কোটি ২৬ লাখ টাকা) এবং অর্থবছর শেষে দেখা যায়, মোট বরাদ্দের ৯৭ শতাংশ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে সফলভাবে নিযুক্ত হয়েছে। 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের মোট পাঁচ বছর মেয়াদের প্রতি অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ নিয়মিত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কার্যক্রমের তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০১১-২০১২ সালে ৩৩৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। পরবর্তী অর্থবছরে (২০১২-২০১৩) এই বাজেটের পরিমাণ হয় ৩৮০ কোটি ২৯ লাখ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এই বাজেটের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০০ কোটি টাকা।

'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৪ তে সমাপ্ত হওয়ার পর আরও এক বছর বাড়িয়ে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ২০১৫ সালে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পর বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকের যাবতীয় কার্যাবলি 'কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার' প্রকল্প হিসেবে এককভাবে পরিচালিত হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৭৫ কোটি টাকা এবং বর্ধিত বছরে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় ৪২৬ কোটি ৮১ লাখ টাকা।

চিত্র ১: কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পে আর্থিক সংশ্লেষের ক্রমধারা

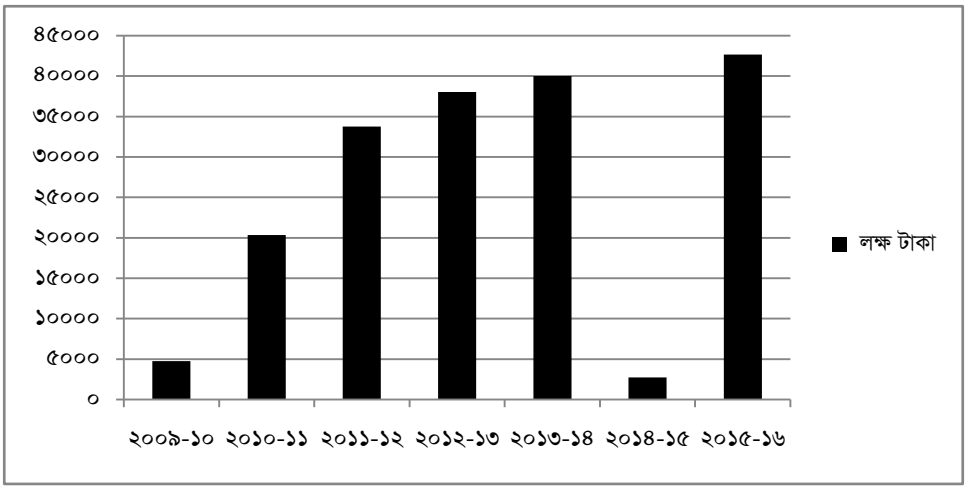

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ (২০০৯-২০১৬)।

বাজেট বরাদ্দের ক্রমানুমিক ধারা (চিত্র ১) বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য নীতি বাস্তবায়নের অন্যতম মুখ্য কার্যক্রম হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের জন্য যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক বছরগুলোতে বাজেট বরাদ্দের ঊর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। সাত বছর কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ থাকার কারণে অবকাঠামোগত সংস্কার, নতুন সেবাপ্রদানকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম পুনঃসংস্থানের জন্য মূলত এই অর্থ ব্যয় হয়। প্রকল্পের পরবর্তী বছরগুলোতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেলেও প্রবৃদ্ধির হিসাবে এর ধারা নিম্নমুখী ছিল। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে সংস্কার কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পরে এই প্রকল্পের আর্থিক চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পে আর্থিক সংশ্লেষের হার ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ পর্যন্ত, যা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কার্যকরি বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ। একইসাথে আর্থিক বরাদ্দের ঊর্ধ্বমুখী ধারা ও আর্থিক সংশ্লেষের ধারাবাহিক স্থিতিশীলতা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের নথিবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক ছিল এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সরকারের সদিচ্ছার কোনো অভাব ছিল না তার প্রমাণ দেয়।

৪.২। কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ঔষধ সরবরাহের ক্রমধারা বিশ্লেষণ

কমিউনিটি ক্লিনিকের গঠননীতি অনুযায়ী, ক্লিনিকসমূহে অধিকাংশ জরুরি ঔষধের সরবরাহ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে দেয়া হয়। 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের প্রারম্ভিক বছরে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের জন্য ৫৮ কোটি টাকা মূল্যের ২৫ প্রকারের ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তী বছরে ৯১ কোটি টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয়, যেখানে ২৮ প্রকারের ঔষধ ছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরে সরবরাহকৃত ঔষধের মূল্যমান ১২৮ কোটিতে দাঁড়ায় কিন্তু ঔষধের প্রকারের সংখ্যা ২৯টি সীমাবদ্ধ থাকে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের জন্য ১৩৬ কোটি টাকার ঔষধ সরবরাহ করা হয় যাতে ৩০ প্রকারের ঔষধ ছিল।

সারণি ১: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ঔষধ সরবরাহের ক্রমধারা

অর্থবছর	সরবরাহকৃত ঔষধের মূল্যমান (টাকা)	ঔষধের প্রকার
২০০৯-১০	৫৮ কোটি	২৫
২০১০-১১	৯১ কোটি	২৮
২০১১-১২	১২৮ কোটি	২৯
২০১২-১৩	১৩৬ কোটি	৩০

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ (২০০৯-২০১৩)।[১]

[১]'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের জন্য ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ সালের ঔষধ সরবরাহের কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যায়নি।

সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত ঔষধের মূল্যমান ও প্রকরণের যুগপৎ বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের অধীনে ঔষধ সরবরাহ ব্যয় প্রতিবছর বৃদ্ধি পেলেও সেই বৃদ্ধির হার সমানুপাতিক ছিল না। সেই সাথে ঔষধের প্রকরণ প্রকল্পের প্রারম্ভ বছরে ২৫ থেকে চতুর্থ বছরে এসে ৩০ এ উন্নীত হয়। এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কমিউনিটি ক্লিনিকের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র, দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সরবরাহ সাধনে সরকারের পক্ষ থেকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু ঔষধের প্রকরণ বৃদ্ধি না পাওয়ার বিষয়টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদানে সক্ষমতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক (অথবা অন্যমতে হতাশাব্যঞ্জক) চিত্র সামনে আনে। যদিও কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রশিক্ষিত সেবাদানকারীরা শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিন্তু ঔষধের প্রকরণের সীমাবদ্ধতা- একদিকে যেমন তাদের সেই দায়িত্ব পালনের পরিসরকে সংকীর্ণ করে তেমনি অন্য দিকে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের সেবাকাঠামোর পরিধি বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস করে।

৪.৩। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে গ্রামীণ এলাকায় যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ স্থাপন করেছে এবং নিয়মিতভাবে এই খাতে আর্থিক বরাদ্দ ও ঔষধ সরবরাহ করেছে, বাস্তবক্ষেত্রে সরকারের এই উদ্যোগ সাধারণ জনগণের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এর অনুসন্ধানে বর্তমান গবেষণায় 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের অধীনে কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (২০০৯-২০১৪) কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে সেবাগ্রহীতাদের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রকল্প চলাকালীন ৫ বছর সময়ে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১০ সালে ১৪.৬ মিলিয়ন মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি মাসে ১.৬৩ মিলিয়ন মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছে। ২০১০-১১ সালে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩.৬৯ মিলিয়ন অর্থাৎ গড়ে প্রতিমাসে ১.৯৭ মিলিয়ন। ২০১১-১২ সালে প্রতিমাসে ৩.১১ মিলিয়ন মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য সেবা নেয় এবং বাৎসরিক সেবাগ্রহীতার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭.৩ মিলিয়ন। প্রকল্পের শেষ দুই বছরে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭২.২৩ মিলিয়ন ও ৭৪.৪৭ মিলিয়ন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাব থেকে দেখা যায়, 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরও উক্ত বছরে ১০৬ মিলিয়ন মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২: কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ঔষধ সরবরাহের ক্রমধারা

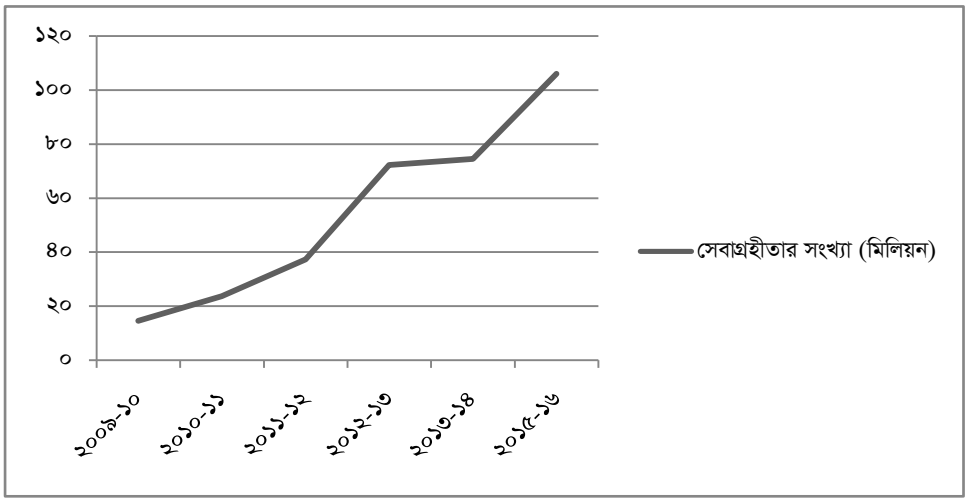

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ (২০০৯-২০১৬)।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপণের উদ্যোগ নেয়ার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল উপজেলা পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহের সাথে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে একটি সংযোগ বিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে করে জরুরি ও গুরুতর স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশসহ প্রেরণ করা যায়। ২০০৯-১০ সালে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ২৫ হাজার রোগিকে উপজেলা পর্যায়ে সেবা গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করা হয় এবং ২০১৩-১৪ সালে রেফারেলপ্রাপ্ত রোগির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৮ জন।

'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের অধীনে কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার প্রকল্পের সেবাগ্রহীতা ও রেফারেলের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির কেন্দ্র হিসেবে আস্থা অর্জন করেছে এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্তি ও প্রতুলতা নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য নিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ স্থাপিত হয়েছিল স্বাভাবিক বিবেচনায় তা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৪.৪। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কর্মপদ্ধতি, অবকাঠামো ও সেবাপ্রদান ব্যবস্থার অনুসন্ধান

এই প্রবন্ধের ভিত্তিমূলক জরিপ ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা ও ফুলবাড়িয়া উপজেলার ২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পরিচালিত হয়েছে। বিস্তারিত পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থানীয় জনগণের দানকৃত জমিতে স্থাপিত হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের জমির পরিমাণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৫ শতাংশ। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক ১৯৯৮ সালে স্থাপিত এবং পুনঃসংস্কারের পর অধিকাংশই ২০০৯ বা ২০১০ সালে কার্যক্রম শুরু করেছে। জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গড় দূরত্ব ৮.৭ কিলোমিটার।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর কোনোটিতেই এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ নেই যদিও 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' কার্যক্রমের নীতিমালায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের কথা উল্লেখ ছিল। কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের যে সরকারি ওয়েবসাইট তাতে ক্লিনিকগুলোর জন্য সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপিত হবে- এইরূপ উল্লেখ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তার কোনো বাস্তব নিদর্শন পাওয়া যায়নি। কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনাতে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা অর্থাৎ ই-হেলথ সার্ভিস প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে ক্লিনিকসমূহকে ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ২৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকের কোনোটিতেই এইরূপ ব্যবস্থার কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়নি।

জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের প্রতিটিতে নলকূপ সুবিধা থাকলেও তার কোনোটিই শুরু থেকে ব্যবহারোপযোগী ছিল না। জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাত্র ৬টিতে ব্যবহারোপযোগী নলকূপ পাওয়া গেছে এবং বাকিগুলোকে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য এই জরিপ চলাকালীন সময় পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অর্থাৎ দৃশ্যত এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে নিরাপদ সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ পরিদর্শন করে দেখা যায়, রোগীদের অপেক্ষার স্থানসমূহ অপরিসর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অব্যবহৃত সরঞ্জাম রাখার কারণে বসার উপযোগী নয়। নারী রোগী ও গুরুতর রোগীদের জন্য পৃথক কোনো বসার স্থান নেই।

নিয়মানুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবার ছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত প্রতিদিন মোট ৬ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার কথা। কিন্তু দলগত আলোচনা ও প্রশ্নভিত্তিক জরিপের মাধ্যমে জানা যায় যে, বস্তুত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রতিদিন সাড়ে ৩ ঘন্টার বেশি সেবা কার্যক্রম চলে না। এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা ও সেবাপ্রদানকারী দুই পক্ষ থেকে দুই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীদের মতে, রোগীরা সাধারণত সকাল সাড়ে ১০টার আগে কখনোই ক্লিনিকে আসেন না এবং সেই কারণে তারা সকাল ৯ টার নির্ধারিত সময়ে কিংবা সকাল ১০টার আগে কার্যক্ষেত্রে পৌছানোর প্রয়োজন অনুভব করেন না। অন্যদিকে সেবাগ্রহীতাদের মতে, কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীরা কখনোই সকাল সাড়ে ১০টার আগে ক্লিনিকে উপস্থিত থাকেন না বলেই রোগিরাও এ সময়ের আগে সেবা নিতে আসেন না। সেবাগ্রহীতারা আরও অভিযোগ করেন যে, কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুপুর ২টায় সেবাকেন্দ্র ত্যাগ করেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাপ্রদান শুরু ও শেষের সময়ের এ অসঙ্গতির কারণে ক্লিনিকসমূহে সেবাপ্রাপ্তির দৈনিক কার্যকরি সময় ৬ ঘন্টার পরিবর্তে বাস্তবক্ষেত্রে সাড়ে ৩ ঘন্টায় এসে দাঁড়ায়। এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সেবাপ্রাপ্তির সময়ের এই অসঙ্গতি কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি বাধাস্বরূপ এবং দীর্ঘদিনব্যাপী সময়জনিত এ অসঙ্গতির ধারাবাহিকতা থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানজনিত দুর্বলতাও প্রতীয়মান হয়।

৪.৫। সেবাপ্রদানের সক্ষমতা যাচাই ও কার্যক্ষেত্রে সংকটসমূহ চিহ্নিতকরণ

কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে তিন ধরনের সেবাপ্রদানকারী (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, হেলথ অ্যাসিসটেন্ট ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিসটেন্ট) রয়েছেন। জরিপকৃত ক্লিনিকসমূহে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ৬৩ শতাংশ, হেলথ অ্যাসিসটেন্টের ৫৮ শতাংশ এবং

ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিসটেন্টের ৯৬ শতাংশই মহিলা। এদের বয়স গড়ে ২৬ থেকে ৪২ এর মধ্যে; ২৬ শতাংশ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত, ৪৩ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং ৩০ শতাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছে। জরিপে অংশ নেয়া হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ১০০ শতাংশেরই প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ৯০ দিনের পূর্ণ প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং তারা সপ্তাহে ছয়দিনই সেবাপ্রদান করে থাকে। অন্যদিকে হেলথ অ্যাসিসটেন্টদের ৪ শতাংশ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিসটেন্টদের ৫০ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পর্যন্ত এবং তাদের মধ্যে অন্তত ১৫ শতাংশের কোনো প্রকার প্রশিক্ষণ এখনো সম্পন্ন হয়নি। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের মাসিক গড় বেতন ১০ হাজার টাকা। অপরদিকে হেলথ অ্যাসিসটেন্ট ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিসটেন্টদের মাসিক গড় বেতন যথাক্রমে ১৩,২৬৮ টাকা ও ১৪,২২১ টাকা। হেলথ অ্যাসিসটেন্ট ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিসটেন্টদের বেতন তুলনামূলক বেশি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ তাদের চাকুরিকালীন সময় অধিকাংশ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের চেয়ে বেশি।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সরাসরি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ৯৬ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিক তাদের রোগীদের নিবন্ধন রাখে এবং ১০০ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিক নবজাতক ও গর্ভবতী মায়েদের নিবন্ধন করে। এছাড়া ৩৬ শতাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীরা ঔষধের বর্তমান মজুদ সম্পর্কে তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানায়। জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের মধ্যে ৭৬ শতাংশ পরিচ্ছন্ন এবং ৩২ শতাংশ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা আছে; ২১ শতাংশ ক্লিনিকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত খারাপ। নিয়মানুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে প্রতিমাসে ঔষধ সরবরাহ হওয়ার কথা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ ক্লিনিকে প্রতিমাসে নিয়মিত ঔষধ সরবরাহ দেয়া হয় না। জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর কয়েকটিতে তিন-চার মাসের ব্যবধানে ঔষধ সরবরাহ আসে, যার ফলে সেবাদানকারীরা ক্লিনিকে আগত রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করতে পারে না। এর ফলে রোগীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাত্র ৩৬ শতাংশ সরবরাহকৃত ঔষধের পরিমাণ যথেষ্ট বলে মনে করে।

প্রশ্নভিত্তিক জরিপ থেকে জানা যায়, ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদির অপ্রতুলতা নিয়ে অসন্তোষের পাশাপাশি কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীরা তাদের প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীরা বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার এবং বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভাগ থেকে আগত। কমিউনিটি ক্লিনিকের গাইডলাইন অনুযায়ী, প্রত্যেক কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ১২ সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে ৬ সপ্তাহ তাত্ত্বিক ও ৬ সপ্তাহ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে সেবাপ্রদানকারীদের মান যাচাইয়ের জন্য চারটি পরীক্ষা নেয়া হয়। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডাররা মনে করে মাত্র ১২ সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানের দক্ষতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে যে ধরনের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় তার জন্য বিশদ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, ডায়রিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর, যক্ষা, চর্মরোগ, নাক-কান-গলা ও দন্ত চিকিৎসায় প্রাথমিক সেবা, কাটা-পোড়া ও ফিটব্যামো এবং উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, আর্সেনিক ও নিউমোনিয়া

জাতীয় রোগ চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদেরকে অন্তত ২৪ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে ৭০ শতাংশ সেবাপ্রদানকারী মনে করে। পক্ষান্তরে ৮০ শতাংশ সেবাপ্রদানকারীর মতে, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাসেবার উৎকর্ষ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, রোগের ধরন ইত্যাদির পরিবর্তন হচ্ছে সেই আলোকে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বল্পমেয়াদি কর্মশালার আয়োজন করা উচিত।

৪.৬। সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ব্যবস্থা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতার মধ্য থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। অধিকাংশ সেবাগ্রহীতা মনে করে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের মতো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থাকায় তারা ন্যূনতম প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। জরিপে অংশ নেয়া ৯০ শতাংশ সেবাগ্রহীতা সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার (যেমন: জ্বর, পেটের অসুখ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার ওপর আস্থা রাখে। কমিউনিটি ক্লিনিকের বিনামূল্যে সেবা ও ঔষধপ্রাপ্তির বিষয়টিকে তারা ইতিবাচকভাবে দেখে। তবে অধিকাংশ সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে ঔষধ না থাকার বিষয়টিকে তারা সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বলে মনে করে এবং এ ব্যাপারে তাদের অসন্তুষ্টি জানায়। জরিপে অংশ নেয়া ৮০ শতাংশ সেবাগ্রহীতা গর্ভবতী মা ও নবজাতকের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলেও শিশু জন্মদানের পরে মায়েদের জন্য তেমন কোনো স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ না থাকার বিষয়ে আলোকপাত করে। জরিপে অংশ নেয়া ১০০ শতাংশ সেবাগ্রহীতাই মনে করে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে সাধারণ রোগের পাশাপাশি গুরুতর ও জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এদের প্রত্যেকেই মনে করে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যবস্থা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

মুক্তাগাছা উপজেলার অধীন কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে তিনটি দলগত আলোচনা সম্পন্ন করা হয়। এর প্রথমটি ছিল গর্ভবতী নারীদের সাথে। গড়াইকুঠীর প্রায় ১৫ জন গর্ভবতী মা সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রাথমিক সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যকারিতার প্রশ্নে তাদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। এই নারীদের প্রত্যেকেই কমিউনিটি ক্লিনিকে নিবন্ধনকৃত এবং এখান থেকে প্রতিমাসে চেকআপ করান। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে তাদের বিনামূল্যে নিয়মিত ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট দেয়া হয়। কিন্তু গর্ভাস্থিত শিশুর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আল্ট্রাসনোগ্রামের সুবিধা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র কোনো জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাপ্রদানকারীর সুপারিশে মুক্তাগাছা হেলথ ক্লিনিকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করানো হয়। আলোচনায় অংশ নেয়া মায়েরা প্রত্যেকেই সঠিক মাত্রায় গর্ভকালীন টিকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন। তবে জন্ম নিয়ন্ত্রণসেবার ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের পরামর্শ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অধিকাংশ নারীদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের স্বামীদের অনীহাই মূল কারণ বলে জানা যায়। তবে এসব নারী স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। যদিও তারা মনে করেন কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার পরিধি, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং সেবাপ্রদানকারীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা উচিত যাতে করে তাদের গুরুতর রোগের ক্ষেত্রেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যেতে

না হয়। এছাড়াও তারা কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে বিদ্যুৎ ও পানির অভাব চিকিৎসা সেবাকে ব্যাহত করে বলে মনে করে। তাদের মতে, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে চিকিৎসা সেবাপ্রদানকারীদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করা গেলে সেবার মান আরও উন্নত হবে।

দ্বিতীয় দলগত আলোচনাটি করা হয় কৃষ্ণনগরের ১২ জন কিশোরীদের একটি দলের সাথে। এরা মনে করে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবের কারণে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় না। গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যায় না বলে তাদেরকে উপজেলা পর্যায়ে যেতে হয় এবং এর ফলে যাতায়াতসহ আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়। কিশোরীদের এ দলের সাথে আলোচনায় জানা যায়, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক সমস্যা, কিশোরীদের ব্যক্তিগত শারীরিক জটিলতা ইত্যাদি বিষয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে কোনো প্রকার সেবা পাওয়া যায়নি। টিটেনাস টিকা নেয়ার বিষয়ে তারা অনেকেই অবগত নয় এবং যারা এ বিষয়ে জানে তারাও এ টিকা নেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। আরেকটি লক্ষণীয় গুরুতর বিষয় ছিল যে, এই কিশোরীদের প্রত্যেকেই স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার সম্পর্কে জানে কিন্তু ব্যবহার করে না। এর কারণ হিসেবে তারা তাদের পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতির কথা জানায় এবং তারা মনে করে, কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের পক্ষ থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করা উচিত।

তৃতীয় দলগত আলোচনাটি হয় মণিরামপাড়ার ২০ জন কিশোর ও পুরুষের একটি দলের সঙ্গে। এ আলোচনা থেকে জানা যায় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং মানসম্পন্ন সেবার অভাব রয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদানের সময় আরও বৃদ্ধি করা উচিত বলে তারা মনে করে এবং সেবাপ্রদানকারীদের আরও দক্ষ করে তোলার প্রয়োজন আছে বলে জানায়। এ আলোচনায় অংশ নেয়া পুরুষেরা শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে এবং গর্ভবতী মায়েদের সেবাদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মতামত দেয়। তবে কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিসর আরও বৃদ্ধি করে সেখানে পরিচ্ছন্নতা, বিভিন্ন রোগীদের জন্য আলাদা বসার স্থান, বিদ্যুৎ ও পানির সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করে। এ আলোচনায় অংশ নেয়া কিশোরেরা বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে কোনোরকম স্বাস্থ্য পরামর্শ ও সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ আছে বলে জানে না এবং গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সেবা সম্পর্কেও তারা সম্যকভাবে অবহিত নয়। সাধারণ জ্বর ও পেটের অসুখের ক্ষেত্রে তাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে এবং সেখানে তারা বিনামূল্যে ঔষধ পেয়েছে বলে জানায়।

৪.৭। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশগ্রহণ

মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে জানা যায় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত সভার আয়োজন করলেও সেখানে সাধারণ জনগণের মতামত রাখার সুযোগ থাকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মতামতের প্রতিফলন বাস্তবক্ষেত্রে হয় না। কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনার কমিটির সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করার কথা। এই জরিপে সচেতনতা সৃষ্টিমূলক উদ্যোগসমূহের কার্যকারিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে এলাকার পুরুষদের মধ্যে নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অসচেতনতা কিশোরদের বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং বিশেষ করে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনীহা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে তৎপর থাকলেও জনগণের মাঝে বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিতথ্য ও সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে কমিউনিটি ক্লিনিক সাপোর্ট গ্রুপগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। 'কমিউনিটি বেজড হেলথ ক্লিনিক' প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ নারী ও কিশোর-কিশোরীদের উপস্থিতির কথা বলা হলেও জরিপকৃত কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের ক্ষেত্রে এই অংশগ্রহণ সমভাবে নিশ্চিত হয়নি।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর জন্য আর্থিক বরাদ্দ, ঔষধ সরবরাহ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দান, গর্ভবতী মা ও নবজাতকের সেবার সুযোগ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাথে সংযোগ ও রেফারেল পদ্ধতি, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা ও পরামর্শ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অবকাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংকট, দক্ষ মানবশক্তির অভাব, সেবাকাঠামোতে বিশেষ স্বাস্থ্য চাহিদা (বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য পরামর্শ, শিশুর জন্মের পর মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি) পূরণের সুযোগ না থাকা এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সাপোর্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি ও অদক্ষতার কারণে এই গবেষণার অনুসন্ধানে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি অনেক সংকট ও অসঙ্গতি সমাধানে এখনো সক্ষম হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

৫। উপসংহার

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ তৃণমূল পর্যায়ের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করেছে বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর আওতার বাইরে থাকা দরিদ্র, দুঃস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা কমিউনিটি ক্লিনিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। তবে কিছু সংকট ও সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যা কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা সুফল ও কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রথমত, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন ইত্যাদি সুবিধার কার্যকর অনুপস্থিতি ও স্থান সংকটজনিত কারণে সেবা প্রদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে; দ্বিতীয়ত, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের সেবা প্রদানের সময় ছয় ঘন্টা, কিন্তু চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অসুবিধার কারণে এই ছয় ঘণ্টার কার্যকর ব্যবহার সম্ভব হয় না, তৃতীয়ত, কোনো পর্যায়েই সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধিদলের কোনো তৎপরতা নেই; চতুর্থত, সেবা প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিভিন্ন বিভাগ (মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) থেকে হওয়ায় একটি মাত্র স্বল্প মেয়াদি ট্রেনিং সেবা প্রদানে তাদের দক্ষ করে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। পঞ্চমত, কিছু কিছু এলাকায় ওষুধ সরবরাহ যেমন অত্যন্ত অপ্রতুল তেমনি চিকিৎসা সরঞ্জামেরও অভাব রয়েছে; রোগীদের যে সামান্য পরিমাণ ঔষধ দেয়া হয় তা রোগ নিরাময়ে যথেষ্ট নয় বলে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না।

গর্ভবতী মা, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য চাহিদা পর্যালোচনা করে তাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবার পরিসর আরও বৃদ্ধি করা দরকার। এ ছাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পরিসর বৃদ্ধি করে জরুরি ও গুরুতর রোগের চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করলে গ্রামীণ জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা

প্রদানে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের কার্যকর ভূমিকা আরও ফলপ্রসূ হবে বলে এই প্রবন্ধের অনুসন্ধান থেকে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হলো, কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের বিদ্যমান এ সব সংকটের এর প্রেক্ষিতে কার্যকর সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে কী করা যেতে পারে? এর উত্তরে আলোচ্য প্রবন্ধের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, মৌলিক সেবা সুবিধার প্রতুলতা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারীদের আরও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তোলা, সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকরভাবে তৎপর করে তোলা, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রভাব ও কার্যকর ভূমিকাকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও ইতিবাচক করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

Bangladesh Medical Resear Council (2011): Status and Prospect of Community Clinic in Rural Areas of Bangladesh: An Overview of Healthworkers," *Bangladesh Med Res Counc Bull*, 37: 76-77.

Charles, Normand, Mustak Hassan Iftekar & Syed Aziz Rahman (2002): Assessment of the Community Clinics: Effects on Service Delivery, Quality and Utilization of Services, Health Systems Development Programme, Bangladesh.

Centre on Budget and Policy (2015): Provision of Primary Health Care Services Delivered by Community Clinics, Supported by World Vision Bangladesh, University of Dhaka.

GoB: *Sixth Five Year Plan (2011-15)*, Planning Commission, Government of People's Republic of Bangladesh.

GoB: *Seventh Five Year Plan (2016-20)*, Planning Commission, Government of People's Republic of Bangladesh.

Health Bulletin (2012): Primary Health Care: Revitalization of Community Clinic, ch.4.

HPNSP (2011): *Operational Plan–Community Based Health Care (July 2011–June 2016)*, Health, Population, and Nutrition Sector Development Programme (HPNSP), Directorate General of Health Services, Dhaka.

MoHFW (Various Year): *Annual Report (2009-15*, Ministry of Health and Family Welfare, Government of People's the Republic of Bangladesh.

_____(Various Year): *Budget Documents (2009-2017)*, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

_____(n.d.): *Health Policy 2011*, Miinistry of Health and Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Rabbani, Golam (2010): Agenda Setting on Community Health in Bangladesh, Master in Public Policy and Governance Program, Department of General and Continuing Education, North South University, Bangladesh.